মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

নারী ও আধুনিক চিন্তাধারা

নারী ও আধুনিক চিন্তাধারা
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল
প্রথম ঃ অক্টোবর ২০০৪ ॥
কার্তিক ঃ ১৪১১ বাংলা, রমজান ঃ ১৪২৫ হিঃ ॥

প্রকাশক
মোস্তাফা নাসিরুল হক
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২/৩ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ১০ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

নারী ও আধুনিক চিন্তাধারা

জুলুমের পরিণাম কখনই ভাল হয় না। নারী সুদীর্ঘকাল থেকে নানাভাবে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত। এ অবস্থা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখনই তার ভয়াবহ পরিণতি প্রকট হয়ে দেখা দিতে শুরু করল। বর্তমানকালে জীবনের প্রায় সব কয়টি ক্ষেত্রেই বিপ্লব এসেছে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই সেদিনও নারীকে অত্যন্ত হীন ও নীচু মনে করা হতো, কিন্তু আজ সেই নারীই ইজ্জত ও সম্মানের দাবিদার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে এমন একটা সময় ছিল যখন পুরুষ নারীকে তার যথার্থ মর্যাদা দিতেও প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সে যখন সুযোগ পেয়ে গেল, তখন স্বীয় মর্যাদা ও অধিকার আদায় করতে গিয়ে তার স্বাভাবিক সীমা লংঘন করে সম্মুখের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেল। সীমালংঘনমূলক সে অগ্রগতি আজও চলছে। মুহূর্তের তরেও তা থেমে যায়নি। অতীতের নারী জীবনে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন সে তার ঘরের ক্ষুদ্রায়তন পরিবেষ্টনীর মধ্যেও কিছুমাত্র স্বাধীন ছিল না। কিন্তু আজ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের নারীকে রুখতে পারে এমন শক্তি না ঘরের ভিতর আছে, না ঘরের বাইরে।

আজকে নারী স্বাধীনতার সুউচ্চ পর্যায়ে উপনীত। ঐতিহাসিক কার্যকারণ এই ব্যাপারে তার পক্ষে খুব বেশি সহায়ক হয়েছে। ঠিক যে সময় নারীরা পুরুষের নির্যাতন-নিষ্পেষণের অক্টোপাশ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে সক্রিয়ভাবে চেষ্টায় রত, ঠিক সেই সময়ই পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা ঘটে। এই বিপ্লবই নারীর মুক্তিসংগ্রামকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। পূর্বে যে ঘর ছিল তার কর্মক্ষেত্র, তার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চেয়েছিল; কিন্তু ঘরের বাইরে সে কোথায় যাবে, কি করবে, জীবনের কোন নীলনকশাকে সে অবলম্বন করবে, সে বিষয়ে তার কিছুই জানা ছিল না।

কিন্তু শিল্পবিপ্লব তাকে শুধু পথ নয়, উদার উন্মুক্ত লোভনীয় রাজপথ দেখিয়ে দিল। এই বিপ্লব নারীর সম্মুখে জীবনের যে নীলনকশা উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলো, তা ঘরোয়া জীবন থেকেও অধিক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় ছিল। তার এ কথা বুঝে নিতে দেরী হলো না যে, সে এই নীল নকশা অবলম্বন করে গোলামীর জিঞ্জিরকে ছিন্ন করতে পারে। নারী তার পিতা-মাতা ও স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবিষয়টি অতীতে কখনো কল্পনাও করা যায়নি। এই নীলনকশাই তাকে বিদ্রোহ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা, এক্ষণে সে কারুরই মুখাপেক্ষী থাকল না, থাকল না কারুর ওপর নির্ভরশীল। তার প্রয়োজন পূরণ ও লালসার ইন্ধন যোগাবার বিপুল আয়োজন সমারোহ চতুর্দিকে স্তূপীকৃত। সুযোগ সুবিধার সমস্ত দুয়ার তার সম্মুখে উন্মুক্ত অবারিত।

নারী সমাজের এই বিদ্রোহের মূলে নিজেদের অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়ন-ইচ্ছা যতটা কার্যকর ছিল, তার চাইতে অধিক প্রভাবশালী ছিল পুরুষদের বন্ধন থেকে মুক্তি এবং প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। এই কারণে যে সমাজ ব্যবস্থা তাদেরকে পুরুষদের অধীন করে রেখেছিল, তার শৃংখলকেই তারা সর্বপ্রথম ছিন্ন করল। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানযোগ্য ছিল না। তাতে কিছু কিছু দোষ-ত্রুটির অনুপ্রবেশ অবশ্যই ঘটেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাতে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই অশেষ কল্যাণ নিহিত ছিল। তাই এই ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার নয়, সংশোধন হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যবস্থা ও আদর্শের বিরুদ্ধে একবার কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে তা চরম পরিণতি না দেখিয়ে ছাড়ে না, এ এক স্বতঃসিদ্ধ কথা। তাই দেখতে পাই, পুরুষদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী মনে যে ক্রোধ-হিংসা ও বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল তার পরিণতিতে নারীমুক্তি আন্দোলন তার স্বাভাবিক সীমাকেও লংঘন করে গেল— নারীকে এমন এক স্থানে পৌঁছে দিল, যেখানে নারী ঠিক নারী থাকতে পারলোন না, হয়ে গেল অনেকাংশে পুরুষের প্রতিরূপ। কিন্তু নারীর পুরুষরূপ কোনক্রমেই বাস্তব হতে পারে না। তা নিতান্তই কৃত্রিম ও অন্তঃসারশূন্য। কেননা প্রকৃতপক্ষে নারীর পুরুষ হয়ে যাওয়া কখনোই সম্ভবপর হতে পারে না। পুরুষ কখনো পারে না নারী হয়ে যেতে।

উভয়ই সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দেহাবয়ব, আকার-আকৃতি শক্তি ও যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। একই স্থান, একই আবহাওয়া ও পরিবেশ, একই পিতা-মাতার সন্তান হয়ে এবং একই ঘরে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও নারী ও পুরুষ স্বভাব প্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অধিকারী। এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য এতই বেশি যে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের একই প্রজাতীয় দুই ব্যক্তির মধ্যেও অতটা পার্থক্য হতে পারে না, যতটা এ দুয়ের মাঝে বিদ্যমান। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণ, বংশ, আবহাওয়া, পরিবেশ, ভৌগলিক অবস্থান ও ভাষার পার্থক্য কিছুমাত্র মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী নয়। অন্যদিকে নারী-পুরুষের পার্থক্য অতীব মৌলিক, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতালব্ধ অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, নারীত্ব ও পুরুষত্বের এই পার্থক্য খুব নগণ্য বা সামান্য ব্যাপার নয়। শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পরিবেশের প্রভাব দ্বারা এই পার্থক্য অতিক্রম করা কখনোই সম্ভবপর হতে পারে না। কেননা মানবসত্তায় জন্মগতভাবেই যে যোগ্যতা বিদ্যমান মানুষ কেবল তারই লালন ও বিকাশ সাধন করতে পারে। যে শক্তি বা যোগ্যতা আসলেই তার মধ্যে নেই, তার উন্নতি বা বিকাশ সাধনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। নারী বা পুরুষ— প্রশিক্ষণ ও চেষ্টা-সাধনার সাহায্যে খোদাপ্রদত্ত শক্তি ও যোগ্যতারই প্রবৃদ্ধি সাধন করতে পারে, নবতর কোন যোগ্যতা মৌলিকভাবে ও নতুন করে সৃষ্টি করার সাধ্য কারুর নেই।

প্রত্যেক যুগের ইতিহাস থেকেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আজ পর্যন্ত লব্ধ কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই এই কথাকে অসত্য প্রমাণ করতে পারেনি। "Man The Unknown" গ্রন্থের লেখক নোবেল প্রাইজ বিজয়ী প্রখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ আলেকসিস ক্যারেল লিখেছেন ঃ

> "পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা মৌলিক পর্যায়ের। তাদের দেহের রগ-রেসা-স্নায়ু সংগঠন ভিন্নতর বলেই তাদের মধ্যকার এই পার্থক্য। নারীর ডিম্বকোষ থেকে যে রাসয়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়, তার প্রভাব নারীদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গে প্রতিফলিত হয়। নারী ও পুরুষের স্বভাবগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্নতার কারণও এই।"

বস্তুতঃ নারী ও পুরুষ কেবল মাত্র দৈর্ঘ্য ও আকার-আকৃতি, অস্থি-মজ্জা, গঠন ও স্নায়ু সংগঠনের দিক দিয়েই ভিন্ন নয়, এদিক দিয়েও তারা ভিন্নতর

যে, তারা সমান পরিমাণের বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করে না। তাদের রোগও হয় ভিন্ন রকমের, বিভিন্ন রূপের ও বিভিন্ন প্রকৃতির। তাদের মনের ঝোঁক-প্রবণতা ও নৈতিকবোধও একই রকমের নয়। এখানে পুরোপুরি বৈচিত্র্য অবশ্যই লক্ষ্যণীয়।

আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দীকাল পূর্বে যখন নারী স্বাধীনতার আন্দোলন এতটা ব্যাপকতা লাভ করেনি তখনও এই ধরনের মত ও চিন্তাধারা বিগগ্ধ মহলে প্রকাশ করা হয়েছিল। উনবিংশ শতকের বিশ্বকোষে লিখিত হয়েছিলঃ

> "পুরুষ ও নারীর যৌন অংগের সংগঠন ও আকৃতির বিভিন্নতা যদিও খুব বড় বিভিন্নতা বলেই মনে হয় কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল এই দিক দিয়েই নয়— নারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুরুষদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অনেকটা ভিন্নতর। যেসব অঙ্গ বাহ্যতঃ পুরুষদের সদৃশ মনে হয় তাও।"

নারী ও পুরুষের মধ্যকার এই জন্মগত ও স্বভাবগত পার্থক্যের কারণে প্রত্যেকের দ্বারা তার শক্তি, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অনুপাতেই কাজ গ্রহণ করা এবং তাকে সেই ধরনের কাজে নিযুক্ত করাই স্বাভাবিকতার দাবি। জীবনের অনেকগুলো ক্ষেত্রে ঠিক তাই করা হচ্ছে আবহমানকাল থেকে। সাধারণত কোন প্রকৌশলীকে কৃষি কাজে নিযুক্ত করা হয় না। শিক্ষা বিশেষজ্ঞকে জাহাজ নির্মাণের কাজে। দুই জন পুরুষের মাধ্যে যোগ্যতা, ঝোঁক-প্রবণতা, রুচি ও অনুপাতিকতার দৃষ্টিতে অবশ্যই পার্থক্য করা যায়, নারী ও পুরুষের মাঝে এইরূপ মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষ হিসেবে তারা অভিন্ন কিন্তু উভয়ের দৈহিক ও আঙ্গিক সংগঠন, মনস্তত্ব ও মানসিকতা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের ওপর আবর্তিত বিভিন্ন অবস্থা— উভয়ের আবেগ উচ্ছ্বাস ও অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিভিন্ন। তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের সৃষ্টিই হয়েছে আলাদা ধরনের প্রকৃতিতে ও ভিন্ন উদ্দেশ্য। প্রকৃতি উভয়ের দ্বারা একই ধরনের ও একই রকমের কাজ নিতে ইচ্ছুক নয়; বরং চায় ভিন্ন ভিন্ন কাজ নিতে। তার আংগিক ও মনস্তাত্বিক বিভিন্নতার মূলে কারণটিই তীব্রভাবে নিহিত।

কিন্তু আধুনিক কালের নব্য চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ নারী-পুরুষকে একই ক্ষেত্রে টেনে এনেছে এবং ঠিক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর একই

ক্ষেত্রে উন্নতি-অগ্রগতি লাভের সুযোগ-সুবিধাও উভয়কে একই রকমেরই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু নারী ও পুরুষের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা যে এক ও অভিন্ন নয়, সে কথা একবারও চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে না। এ পর্যায়ে পেশ করার মতো স্বভাবগত ও মনস্তাত্ত্বিক কোন প্রমাণই তাদের হাতে নেই। যে যে কাজ পুরুষরা করতে পারে, সেই সেই কাজ মেয়েরাও সাধারণতঃ করতে পারে— এমন অকাট্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত পেশ করা সম্ভবপর হয়নি।

আলেক্সিসিজ ক্যারেল পুরুষ ও নারীর মধ্যকার স্বভাবগত মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য ও বিভিন্নতা পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

> "নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বভাবগত পার্থক্য প্রমাণকারী মৌলিক সত্যকে উপেক্ষা করার কারণে নারী স্বাধীনতার আন্দোলনকারীরা দাবি করেছে যে, নারী ও পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন ও সমান সমান হতে হবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, এই দু'য়ের মধ্যে সীমাহীন পার্থক্য বিদ্যমান। নারীদেহের প্রতিটি কোষের ওপর তার নারীত্বের চিহ্ন অংকিত রয়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও এই কথাই সত্য— বিশেষ করে তার স্নায়ুমন্ডলী সম্পর্কে। নারীদের কর্তব্য তাদের স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী নিজেদের ঝোঁক প্রাবণতার রূপায়ণ। পুরুষদের অনুকরণ করা তাদের উচিত নয়। সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতিতে নারীদের তুলনায় পুরুষদের অবদান অনেক বেশি। এই কারণে তাদের নিজেদের বিশেষ কর্তব্যসমূহের ব্যাপারে কোনরূপ উন্নসিকতা সম্পূর্ণরূপে অনুচিত।"

বস্তুত নারী-পুরুষের মধ্যকার স্বাভাবগত ও জন্মগত পার্থক্য ও বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা কর্তব্য। উভয়ের মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য ইউরোপ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেনি। পারেনি এ পার্থক্যকে দূর করে উভয়কে সর্বতোভাবে একাকার ও অভিন্ন করে তুলতে। ফলে নারী-পুরুষের সাম্যের যে দাবি আধুনিক সমাজে জোরদার হয়ে উঠেছে, তা সর্বৈব মিথ্যা ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।

একালে মনে করা হচ্ছে যে, এইরূপ করতে পারলেই নারীদের করুণ মর্মান্তিক অবস্থা দূর করা ও তা থেকে তাদের মুক্তিসাধন সম্ভবপর হবে। মনে করা হচ্ছে যে, সমাজে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে বলেই নারী উপেক্ষিত,

পদদলিতা; নারী সমাজ নিজেদের জান-মাল সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকেও এই কারণেই বঞ্চিত। এই কারণে, তাদের মতে, নারীদেরও পুরুষদের মতোই অধিকার দিতে হবে। উপরন্তু সমাজে কেবল পুরুষদেরই প্রাধান্য দেয়া চলবে না। এই প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব যেসব কারণ ও উপায় উপকরণের দরুন অর্জিত হয়ে থাকে, তা মানব জাতির বিশেষ এক অংশের জন্য নির্দিষ্ট করে না দিয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য তার দ্বার সমানভাবে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। নারীদেরও সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চতর পদে নিয়োগ করতে হবে। তা না হলে মানব জাতির এক অংশের লোকেরাই অগ্রগতি লাভ করবে আর অপর অর্ধাংশের লোকেরা থাকবে পশ্চাদপদ হয়ে। তার ফলে সমাজ সামষ্টিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতি লাভ করতে পারবে না। কেননা সমাজের যে অংশ বা শ্রেণী অনুন্নত ও পশ্চাদপদ থেকে যাবে, তারা অপর অংশ বা শ্রেণী কর্তৃক শোষিত ও নিষ্পেষিত হবে। ক্ষমতাশালী শ্রেণীর লোকেরাই যে জুলুম করে এবং তাদের সে জুলুম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারুর থাকে না– এতো সর্ববাদী সম্মত তথা!

এ হলো নারীর সামাজিক অধিকার ও দায়িত্বকে অভিন্ন মনে করার দৃষ্টিকোণ। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ দুটি অভিন্ন নয়। এ দুয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কারুর প্রতি সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের আচরণ গ্রহণ এক কথা, আর তাকে কোন নির্দিষ্ট সামাজিক কাজে নিয়োগ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এই দুটি বিষয়কে এক ও অভিন্ন মনে করা একটা মারাত্মক ধরনের ভুল। কেননা তার ফল এই দাঁড়াবে যে, কেউ কোন বিশেষ ধরনের কাজ করতে অক্ষম হলে তাকে সামাজিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে হবে।

নারীদের ওপর জুলুম ও অবিচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে এবং তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলে মনে করতে হবে, রাষ্ট্র ও সমাজ তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অক্ষম রয়েছে বলেই এমন হয়েছে। নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধাসমূহ তাদের জন্য সহজ লভ্য করে দেয়া তো রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। যে রাষ্ট্র তার এই কর্তব্য পালন করে না, তার অস্তিত্ব জনগণের জন্য একেবারে অর্থহীন। বিশেষ কোন নাগরিককে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা বা বঞ্চিত হয়ে থাকতে দেয়ার কোন অধিকারই থাকতে পারে না কোন রাষ্ট্রের। সেই সঙ্গে জনগণের বিভিন্ন

শ্রেণী ও গোষ্ঠীর প্রতি পার্থক্যমূলক আচরণ গ্রহণ করাও কোন রাষ্ট্রের পক্ষে শোভন হতে পারে না। কোন রাষ্ট্রে সেরূপ হতে থাকলে সে রাষ্ট্রের চরিত্রকেই পরিবর্তিত করে দেয়া উচিত। কেননা এটা একটা গুরুতর অপরাধ তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

কিন্তু কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হলেই যে তাকে নির্বিশেষে সর্বপ্রকারের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। কেননা বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার। আর সব রকমের লোকেরই যে সব রকমের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা থাকবে, এমন কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। কাজেই নারীদের যে যে কাজ করার সত্যিই যোগ্যতা আছে তাদের কেবল সেই সেই কাজেরই দায়িত্ব দেয়া উচিৎ। যে যে কাজের যোগ্যতা স্বভাবতঃই তাদের নেই, সেই সেই কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে তার মত জুলুম ও অমানুষিক কাজ আর কিছু হতে পারে না।

আধুনিক সমাজ এই যুক্তিপূর্ণ কথাটিকেই উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে চলেছে। এ কালের লোকেরা কয়েক ধরনের বিশেষ কাজ, পেশা ও শিল্পকেই উন্নতি ও সম্মানের প্রতীক মনে করে নিয়েছে। বস্তুত মান-সম্মান ও অপমান-লাঞ্ছনার এ এক মনগড়া মানদণ্ড। এই মানদণ্ড রচনা করা হয়েছে পুরুষদের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে সমানে রেখে। নারীদের মেজাজ-প্রকৃতির প্রেক্ষিতে এই মনদণ্ড রচিত হয়নি। তা সত্ত্বেও এই মানদণ্ডের ভিত্তিতেই নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য নারীদের আহ্বান জানানো হয়েছে। এটা যে কত বড় অবিচার তা বলে শেষ করা যায় না। বস্তুত প্রকৃতি যার মধ্যে যে যোগ্যতা রেখেছে সেই ধরনের কাজকেই তার সাফল্যের মানদণ্ডরূপে নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। কেবল তাহলেই নারী ও পুরুষ— মানব জাতির উভয় অংশের লোকেরা নির্দিষ্ট মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে। অন্যদিকে মেয়েদের স্বাভাবিক যোগ্যতার মানদণ্ডে পুরুষদের উন্নীত হতে বলা যেমন হাস্যকর, পুরুষদের স্বাভাবিক যোগ্যতার মানদণ্ডে নারীদের উন্নীত হবার আহ্বান জানানোও তেমনি হাস্যকর। কেননা, এরূপ হলে প্রত্যেককে স্বীয় স্বভাব-প্রকৃতির সাথে দ্বান্দ্বিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার মতো মারাত্মক ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না।

বলা হয়, বর্তমানে নারীর যা প্রকৃতি, তা কৃত্রিম। তা তার আসল প্রকৃতি নয়। পুরুষদের ক্রমাগত ও দীর্ঘকালীন নিপীড়ন ও শোষণ-নির্যাতনের শিকার হতে থাকার ফলেই নাকি বর্তমানে নারী-প্রকৃতি পুরুষদের তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়েছে— তার চিন্তা ও কর্মশক্তি অনুন্নত ও অনগ্রসর হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাকে তার চর্চা ও লালন করার সুযোগ দেয়া হয়নি বলেই নাকি তার এই অবস্থা! যদি তা না হতো, পুরুষের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা যদি তারাও লাভ করতে পারত, তাহলে আজ তাদের প্রকৃতি নাকি পুরুষদের মতোই হতো; বরং তারা স্বাভাবিক যোগ্যতা-কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে নাকি পুরুষদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারত।

যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই দাবি টেকে না। স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা পেলে নারী সর্বদিক দিয়ে পুরুষদের সমান হতে পারত— এ সম্ভাবনা মেনে নিলে, সেরূপ না হতে পারার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করতে হবে। এ দুটি সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে সমান মাত্রার। এ দৃষ্টিতে বলা যায়, নারীদের মধ্যেও পুরুষালী দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রয়েছে বলে যে দাবি করা হয় তার কোন ভিত্তি নেই। বিশেষত নারীর বর্তমান মনস্তত্ত্ব ও যোগ্যতা কর্মক্ষমতাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, জীবন সংগ্রামে তার ক্ষেত্র পুরুষদের ক্ষেত্র থেকে সর্বতোভাবে ভিন্নতর। আর পুরুষদের স্বভাবগত যোগ্যতা কর্মক্ষমতাও নিঃসন্দেহে প্রামণ করে যে, তাদের কর্মক্ষেত্র নারীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া একান্তই আবশ্যক।

পুরুষদের অবিচার ও নিষ্পেষণই নারীকে তার অন্তর্নিহিত আবেগ ও যোগ্যতার বিকাশ ও প্রকাশ সাধন করতে দেয়নি এবং তার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তাও সম্পূর্ণ বাস্তবতার পরিপন্থী। সামষ্টিক মনস্তত্ত্ব পারদর্শীগণ সুস্পষ্টকণ্ঠে বলেছেন ঃ নারী অপূর্ব উদার সুযোগ-সুবিধা পেয়েও নিজেদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রের বাইরে উল্লেখযোগ্য কোন কীর্তি সাধন করতে পারেনি। বস্তুত নারী স্বভাবতঃই অন্যের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য উদগ্র হয়ে থাকে। তার মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার বাসনা ও প্রেরণা পুরুষদের ন্যায় প্রবল নয়। এ কোন মনগড়া বা বিদ্বেষমূলক কথা নয়। এ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য। মানব ইতিহাসে এমন কোন কীর্তিময়ী নারীর নাম পাওয়া যায় না, যে পুরুষদের সাথে নিঃসম্পর্ক হয়ে স্বতন্ত্র ও নিজস্বভাবে মানব জাতির জন্যে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। মাদাম কুরি তাঁর স্বামী মিঃ কুরির সঙ্গে থেকে বিজ্ঞানে, মিসেস ব্রাউনিং তাঁর জীবন সঙ্গী মিঃ ব্রাউনিং-এর সঙ্গে থেকে কাব্যে এবং জজ ইলিয়ট মিঃ লিউসের সঙ্গে থেকে উপন্যাস রচনায় যে অবদান রেখেছেন তা নিতান্তই সহযোগিতা নির্ভর এবং এ সহযোগিতা এসেছে পুরুষদের নিকট থেকে। ইতিহাসে একটা কালস্রোত এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন নারী পুরুষের সমান চেষ্টা-সাধনার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মাঝে যে পার্থক্য রেখেছে তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। এ কালেও বহু সভ্যতা আলোক বঞ্চিত সমাজে নারীরা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বন্দী হয়ে না থাকা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা পুরুষদের সমান যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। কোনদিন তা হতেও পারবে না। বর্তমান সভ্য যুগটাই একবার বিচার করা যাক। এই যুগে নারীরা পুরুষদের সমান স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা— অন্ততঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহে— পেয়েছে বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এই স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা কি নারীদের দৈহিক সংগঠন ও প্রকৃতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছে? নারী ও পুরুষের দৈহিক ও মগজ সংস্থানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। এই ব্যবধান যেমন প্যারিসের মতো একটা সাংস্কৃতিক লীলাকেন্দ্রের অধিবাসীদের মধ্যে প্রকট, তেমনি প্রকট আমেরিকার জংলী বর্বর জাতিগুলোর মধ্যেও। বরং সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্বভাবগত পার্থক্যও তীব্র হয়ে উঠে। শ্বেতাংগ নারী-পুরুষের মধ্যে যেমন এই পার্থক্য, কৃষ্ণাঙ্গ নারী-পুরুষের মধ্যেও এই পার্থক্য নিঃসন্দেহে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নারীকে যদি সামাজিক ও সামষ্টিক-সাংস্কৃতিক কাজ-কর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় তাহলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতি স্তিমিত হয়ে যাবে বলে আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টার সাহায্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির যেসব পর্যায়ে মাত্র পঞ্চাশ বছরে অতিক্রম করা সম্ভব, নারীদের বাদ দেয়া হলে সেসব পর্যায় একশ' বছরেও অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। এ কথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, নারী তার স্বভাবগত কার্যাবলীতে ব্যস্ত থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন কল্যাণই করছে না। কিন্তু এ কথার পিছনে কোন অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। কেননা

সমাজ কোন প্রকৌশলগত প্রতিষ্ঠান নয়। বিশেষ এক ধরনের কাজে সকলে মিলে আত্মনিয়োগ না করলে সমাজেরই কোন উন্নতি হবে না এমন কথা অর্বাচীনই বলতে পারে। জীবনের বিভিন্ন বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ সংযোজন ও সমন্বয়েরই নাম সমাজ। এই সমাজেরই বহু কয়টি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগে ও বহু কয়টি ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে আছে আমাদের নারীকুল। এ ক্ষেত্রটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ ক্ষেত্র সে ত্যাগ করে চলে গেলে সমাজ প্রাসাদ সহসা ধ্বসে পড়বে। সামাজিক উন্নতি হবে সমাজের সব কয়টি বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত উন্নতিলাভে। তখনই জীবনের সামষ্টিক মান হতে পারে সমুন্নত। শ্রমিকদের উন্নতি শ্রমকাজের সুযোগ-সুবিধা ও স্বচ্ছন্দ্য লাভে। সাংবাদিকদের সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে মুনাফা লাভে যেমন সামাজিক উন্নতি নিহত, তেমনি নারীকে তার নিজস্ব ক্ষেত্র ও পরিবেষ্টনীতে সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হলেই তাদের এবং সমাজেরও উন্নতি লাভ সম্ভব। অন্যথায় সমাজের উন্নতির দোহাই দিয়ে শিল্প শ্রমিকদের চাষাবাদের কাজে, সাংবাদিকদের শিক্ষকতার এবং ব্যবসায়ীদের প্রশাসন যন্ত্র চালাবার কাজে লাগিয়ে দিলে যেমন কোন অগ্রগতির আশা করা যায় না, অনুরূপভাবে নারীদের পুরুষের কাজে নিয়োজিত করা হলেও আশা করা যায় না কিছুমাত্র কল্যাণের। তেমন করা হলে তাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলবে, এমন নির্বোধ এই পৃথিবীতে কেউ আছে বলে মনে করার এখনো কোন কারণ ঘটেনি।

পেশা পরিবর্তনের স্বাধীনতা অবশ্য সকলেরই থাকতে পারে। এক পেশার লোক সেই পেশা ত্যাগ করে অন্য কোন কাজে লাগলে সে নিশ্চয়ই এমন কাজে লাগবে যা করার তার প্রকৃতই যোগ্যতা রয়েছে। যে কাজ করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা আসলেই তার নেই সেই কাজে অংশগ্রহণ করে যে কাজের যোগ্যতা আছে সে কাজটিকেও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়ার সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

বস্তুত নারীর স্বভাবতঃই যে কাজের যোগ্যতা রয়েছে, তার জন্য সেই কর্মের পরিকল্পনাই নেয়া যেতে পারে। সে কাজকে যদি হীন ও নীচ ধরনের বলে মনে করা হয়, তাহলে নারীর স্রষ্টাকেই করা উচিত, তিনি তাকে নারী করে সৃষ্টি করলেন কেন ? কিংবা নারীর জন্য প্রথমে ইচ্ছামত একটা পরিকল্পনা তৈরী করে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নারীর মধ্যে মৌলিক

পরিবর্তন আনবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এ ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে ?

নারী যে বিশেষ একটি ক্ষেত্রেরই কাজ করতে পারে, এ মতটি কি একালে বদলে গেছে ? না, যায়নি। বদলে যাওয়ার কোন কারণও ঘটেনি। সভ্যতার বর্তমান উন্নতি-অগ্রগতির মূলে নারীদের ও পুরুষদের সমান অবদান রয়েছে বলে দাবি করা হলে ইতিহাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কথা বলা হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও অগ্রগতিতে নারীদের অংশ খুবই সামান্য। এই ক্ষেত্রে নারী সমাজ উল্লেখযোগ্য কোন অবদানই রাখতে পারেনি। বিজ্ঞানের কোন একটি বিভাগেও নারীর একক কোন মহান কীর্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তার কারণও রয়েছে। এসব কাজের ক্ষেত্র নারীর স্বভাব-উপযোগী নয়। এই ক্ষেত্রে কিছু একটা করার যোগ্যতাও তার নেই। সে যদি এ ক্ষেত্রে পা রেখেও থাকে, তবে সে এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক সত্তা। এ ক্ষেত্রে কাজ করার যত সুযোগ-সুবিধা-স্বাধীনতাই তাকে দেয়া হোক, পুরুষের কর্মক্ষমতা ও কাজের গতির সাথে তাল রেখে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ কালের পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরাই এই সত্য অকপটে স্বীকার করেছেন। একজন স্বল্প শিক্ষিত পুরুষও এক উচ্চশিক্ষিতা নারীর তুলনায় সমাজক্ষেত্রে অনেক বেশি অবদান রাখতে সক্ষম। কেননা নারী হয়ে পুরুষ উপযোগী কাজ করতে গেলে তার নারীত্বই এ কাজের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তাই বলতে হয়, এ কালে নারীর স্বভাবগত প্রবণতাই সেদিকে চলতে অস্বীকার করছে। ফলে নারীর কোন কল্যাণই সাধিত হচ্ছে না; বরং তাদের সাথে করা হচ্ছে মহা শত্রুতা। এ কালের নারীদের একান্তভাবে ঘর-গৃহস্থালীর কাজ করতে না দিয়ে ব্যাপকভাবে তাদের অফিস, বিপণী, নাট্যমঞ্চেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলে পুরুষরা কেবল বাইরের কাজ করে অবসর পেলেও নারীকে ঘর ও বাহির— উভয় ক্ষেত্রেই কলুর বলদের মতো খেটে যেতে হচ্ছে। এই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে সৃষ্টিলোকের অন্যকোন প্রাণীকেই আজ পর্যন্ত পড়তে হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী অরনল্ড টয়নবির একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ "দুনিয়ার পতন যুগ সাধারণত তখনই সূচিত হয়েছে, যখন নারী ঘরের চার দেয়াল ডিঙ্গিয়ে বাইরে পা রেখেছে।"

বস্তুত প্রাচীনকালের ইতিহাসে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীস উন্নতির উর্তুঙ্গ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু তখন নারী ছিল ঘরের সৌন্দর্য। আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর পর নগর কেন্দ্রিক রাষ্ট্রসমূহের পতনকালে বর্তমান কালের ন্যায়ই এক নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনই সামাজিক পতন ও বিপর্যয়ের সূচনা করেছে। টয়নবির ভাষণ থেকে এ কথা জানা যায়।

নারীর আসল স্থান তার ঘর। এই ঘর ছেড়ে দিলে যে পতন ও বিপর্যয় সূচিত হয় তার দু'টি কারণ হতে পারে। একটি এই যে, এর ফলে সমাজের মৌল উৎস কেন্দ্রই অচলাবস্থার সম্মুখীন হয় এবং বহু সমস্যাই নিষ্পত্তিহীন ও অসম্পাদিত অবস্থায় থেকে যায়। কেননা যে নারীর নিপুন হস্ত এই সমস্যার সমাধান করবে তাই সেখানে অনুপস্থিত। এ কাজ নারীর পরিবর্তে পুরুষদের দ্বারা কখনই সম্ভব হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ, তার ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ের তৎপরতা ও কর্মব্যবস্থা এমন একটা দিকে চলতে থাকে; ইতিহাসের সিদ্ধান্ত এই যে, সেদিকে চলে কেউ কোন দিন সাফল্য বা কিছুমাত্র কল্যাণ লাভ করতে পারেনি।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজে নারী ও পুরুষের সঠিক স্থান এবং এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বভাবসম্মত ও যথার্থ রূপ নির্ধারণের ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ ও অনাসক্ত চিন্তা-বিবেচনার প্রয়োজন বর্তমানে অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই চিন্তা বিবেচনার প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক বিষয় চোখের সামনে চির উদ্ভাসিত রাখা আবশ্যক। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মানুষকে যে দুই ভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা কিছুমাত্র অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন নয়। এই দুই ভাগের পারস্পরিক ও সম্মিলিত সহযোগিতার কারণেই মানব বংশের ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে যে ভাগের লোককে স্বভাবতই যে যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার দ্বারা যদি সেই কাজই গ্রহণ করা হয়, তাহলে কোন অসুবিধা বা বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকতে পারে না। এ থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকের স্বভাবগত যোগ্যতা সৃষ্টি-উদ্দেশ্যের পূর্ণতা বিধানে নিয়োজিত হওয়াই স্বভাবিক নিয়মের দাবি।

আর এজন্য সাধারণভাবে পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাই বলে মানুষের এক অংশের মধ্যে বিশেষ ধরনের যোগ্যতা থাকার কারণেই তাদের অপর অংশের ওপর অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয় ধরনের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। সামাজিক ব্যবস্থা এমন হতে হবে, যার ফলে এই দুই অংশের কোন লোকই যেন নিজের জন্য নির্দিষ্ট কাজকে কোনরূপ লজ্জা, অপমান-লাঞ্ছনা ও হীনতা-নীচতার কারণ বলে মনে করতে না পারে। প্রত্যেকেই স্বীয় স্বভাবজাত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে স্বভাব ও প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবির পরিপন্থী সর্বপ্রকার চেষ্টা-সাধনাকে কোনক্রমেই চলতে দেয়া উচিত হবে না। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক অংশের লোকেরাই নিজেদের বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের অধিকারী হবে। আর তার বাইরে তাদের তৎপরতা যতদূর সম্ভব কম করে দিতে হবে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা হলেই কি পুরুষরা অবলা নারীদের সাথে মমতাভিত্তিক আচরণ গ্রহণ করবে ও তাদের অধিকার আদায়ে তাদের প্রতি সুবিচার করবে ? নারীদের দুর্বল মনে করেই তো আবহমানকাল থেকে পুরুষরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে এসেছে, নিজেদের দাসত্ব নিগড়ে বন্দী করে রেখেছে। দুর্বলদেরকে দুর্বল করে রাখতেই যে তারা তৎপর হবে এবং কোনক্রমেই মাথা তুলে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে দেবে না, এই আশংকাই তো প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তাহলে প্রস্তাবিত স্বভাবসম্মত ব্যবস্থা সমস্যার কতটা সমাধান দিতে পারবে ?

এই প্রশ্নের জবাবে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, উপরে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে তাতে এইরূপ আশংকার সম্ভাবনা আদৌ থাকবে না। কেননা নারীদের প্রতি পুরুষদের যে অমানুষিক আচরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা নিতান্তই অস্বাভাবিক আচরণ। নারী ও পুরুষ নিজ নিজ স্বভাবসম্মত কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে যে অস্বাভাবিকতার আশ্রয় নিয়েছে ও স্বাভাবিকতার সীমা লংঘন করেছে, তারই ফলে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। সেখানেই যদি স্বাভাবিকতাকে ভিত্তি করা হতো, তাহলে এই অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারত না। কাজেই স্বাভাবিক ব্যবস্থায় অস্বাভাবিকতা যে আপনা-আপনি বিদূরিত হবে তাই তো স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষার জন্য অনুকূল আইন-বিধানের বলিষ্ঠ সক্রিয়তা অপরিহার্য। স্বাভাবিক অবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নারী পুরুষ উভয়ের সুস্থ সঠিক শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা থাকার সঙ্গে সঙ্গে যদি তীব্র নিশ্চিত জবাবদিহি ও শাসন-প্রশাসনের ভয় প্রকটভাবে কার্যকর থাকে এবং প্রশাসন ব্যবস্থাও থাকে অতীব সবল, তাহলে কোন পক্ষ থেকেই উল্লেখিত ধরনের অবাঞ্ছিত আচরণের আদৌ কোন আশঙ্কা থাকতে পারে না। এই ব্যবস্থায় নারীর স্থিতি হবে সুদৃঢ়। তার স্বভাবগত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাকে মজলুম ও দারিদ্র্য প্রপীড়িত করে রাখা সম্ভবপর হবে না। বলা ও লেখনি চালনার মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার পূর্ণ অধিকার থাকবে নারীর। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের সমান অধিকার থাকবে তাদের। তাদের ওপর কোনরূপ অবিচার করার ক্ষমতাও কারুর থাকবে না। তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু হবে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। পিতা-মাতা, স্বামী, প্রশাসক কেউই তাদের ওপর কোন বেআইনী কাজের চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। আইনের এই তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের মধ্যে নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ এবং স্নেহ ও ভালবাসা জাগিয়ে তোলা হবে।

এ যদি বাস্তবিকই করা যায়, তাহলে নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন করে দিলে এবং প্রত্যেককে তার স্বভাবগত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার ও উন্নতি-অগ্রগতি লাভের সুযোগ দেয়া হলে কোন সমস্যাই থাকবে না। বস্তুত এইরূপ করেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে নিপতিত বর্তমান বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু রক্ষাই নয়, তাকে উত্তরোত্তর প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী বানানোও এ পন্থায়ই সম্ভব হবে, এ কথা জোরের সাথে বলা যায়।

বলা বাহুল্য, এইরূপ স্বভাবসম্মত ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে উত্থাপন করেছে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দ্বীন ইসলাম। আর ইসলামই যে মানবতার জন্য স্বভাবসম্মত দ্বীন, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।